HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫– বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট

টপিক – ০১ নৃগোষ্ঠীর ধারণা ও প্রকৃতি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

টপিক ০২: বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

টপিক ০৩: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

টপিক ০৪: ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

টপিক ০৫: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০৬: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের এই বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অস্তমিত হয় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। দীর্ঘ ১৯০ বছর কাটে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে। সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৪৭সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে। এর একটি পাকিস্তান, অন্যটি ভারত। পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী দেশের এ অঞ্চলকে (পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান) উপনিবেশের মতো ব্যবহার করতে থাকে। এ অঞ্চলের মানুষ নিয়ত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণে এদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ ও সোচ্চার হয়ে ওঠে স্বাধিকার আদায়ের দাবিতে। এক পর্যায়ে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ছিনিয়ে আনে লাল-সবুজের পতাকা। বিশ্বের মানচিত্রে জন্মলাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের প্রথম স্তরেই 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এ পরিষদের তৎপরতায় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় প্রাদেশিক সরকারের কাছে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিষদের গঠন ও কার্যক্রমের মূল দাবিই ছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। পরবর্তীকালে এ আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রক্তরঞ্জিত পথ পেরিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধিকারের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। আর সে পথ ধরে তাদের উত্তরণ ঘটে স্বাধীনতা সংগ্রামে। জন্ম হয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের। ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষার প্রতি মমত্ব ও দায়িত্ববোধের প্রকৃষ্ট নিদর্শনের প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতি জানাতে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে ইউনেস্কো। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি এখন শুধু বাংলাদেশের জন্য স্মরণীয়-বরণীয় দিন নয়; এটি এখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্যও মর্যাদার দিন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রযন্ত্রে মুঘল আমলে ফারসি, ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি এবং তারই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান আমলে উর্দুকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস শুরু হয়। আর সেই থেকে বাঙালি জাতির চিন্তাচেতনায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় চলে আসে। মহান ভাষা আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর কার্যক্রমের মূল সুর বা বাণী বা দাবিই ছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা। কেননা বাংলা ভাষার যথাযথ স্বীকৃতি ব্যতীত অন্য কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মৌল উদ্দেশ্যই হবে বাংলা ভাষাভাষী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। এটি বাঙালি জাতির জাতাভিমানের প্রতি প্রকাশ্য আঘাত। এটি মেনে নেওয়া মানে বাঙালির স্বাধিকার চেতনার মর্মমূলে কুঠারাঘাত এবং প্রকারান্তরে আবহমানকালের সেই পরাধীন পরিবেশে বসবাস। ভাষা আন্দোলনের সৈনিকরা সমগ্র দেশবাসীকে এ সত্যটি উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে সাঁতচল্লিশে ভারত, বিভাগ ও ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভের পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা সংগতকারণেই সোচ্চার হয়ে ওঠে। যার ফলশ্রুতিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হকসহ বেশ ক'জন বুদ্ধিজীবী প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদ জানান।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তমদ্দুন মজলিস নামে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়। এটি ছিল ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠন। এ সংগঠনের উদ্যোগে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করে বাংলার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চে জিন্নাহর 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং তাদের প্রচারণা প্রয়াসে পূর্ববঙ্গের সচেতন ছাত্র-শিক্ষক-জনতা বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পাওয়ার প্রশ্নে আপসহীন মনোভাব গ্রহণ করে। তাদের দৃঢ়চিত্ত প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা বায়ান্নর ফেব্রুয়ারি মাসের দিনগুলোতে বাংলা ভাঙার জন্য সংগ্রাম উত্তাল আকার ধারণ করে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বুলেটের আঘাতে বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়ে ভাষাশহিদরা সেই সংগ্রামী প্রত্যয় ও প্রেরণাকে বেগবান করেছিলেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশিদের স্বকীয়তা বিকাশে বাংলা ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্বের যেকোনো আন্দোলনের চেয়ে অধিক। দেশবিভাগের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা করতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এর পথ ধরেই ভাষাকেন্দ্রিক মানচিত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় এবং ১৯৭১ সালে এর চূড়ান্ত পরিণতি লাভ হয়। এ আন্দোলন শুধু বাংলার মানুষের মুখের ভাষায় স্ব কৃতি ছিল না, ছিল বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি। যা ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা প্রকাশের আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

নিচে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো-

১. অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ: ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙে বাঙালিরা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই দীর্ঘদিন পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক বৃহৎ রাজনৈতিক দল তাদের দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়। দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

২. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ: পাকিস্তানে মাত্র ৩.২৭% লোকের ভাষা ছিল উর্দু। পক্ষান্তরে, ৫৬.৪% জনগণের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা বাঙালিরা স্বভাবতই মেনে নিতে চায়নি। এর সাথে তাদের জীবিকা অর্জনের প্রশ্নও জড়িত ছিল। এমনিতে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার সংখ্যাধিক্য বিষয়টি অমান্য করে পশ্চিম পাকিস্তানে রাজধানী, প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু স্থাপিত হয়। শাসকদের ভাষা উর্দুকেই তাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বেছে নেওয়ায় বাঙালিদের চাকরিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজনীতিসহ সর্বত্র বাঙালিদেরকে বঞ্চিত করার পশ্চিমা মানসিকতা। তাই ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও দ্বিজাতি তত্ত্বভিত্তিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। তাই অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাঙালিরা বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে বেছে নেয়। এ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসনবিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

৩. সাংস্কৃতিক বন্ধন: ভাষার বন্ধন রচিত হয় এ দেশের মানুষের মুখের ভাষার স্বকীয়তা সৃষ্টির মাধ্যমে। ছাত্রজনতা সম্মিলিতভাবে ভাষার যে স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে রত হয় তা আদায় হয়নি। বরং বাংলা ভাষাভাষীর মধ্যে সর্বজনীন একটি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ধর্মীয় ঐক্যের চেয়ে তীব্রতর হয়।

৪. সংগ্রামী মনোভাব: বাঙালিরা এর পূর্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করলেও সে আন্দোলন সর্বজনীনতা লাভ করেনি। কিন্তু ভাষা আন্দোলন সর্বস্তরে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং ছাত্রজনতা সকলের মধ্যে পাকিস্তান শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ তথা তাদের চাপিয়ে দেওয়া উর্দু ভাষার বিপক্ষে জনমত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৫. মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক বিকাশ: ভাষা আন্দোলনে মূলত ছাত্ররা প্রথম জড়িত হয় যারা প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর ফলে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি সচেতন হয় এবং ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি চর্চা করতে থাকে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

৬. জনগণের স্বতঃস্ফূর্ততা: প্রথমে ভাষা আন্দোলন শুধু শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী মহলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৫২ সালের আন্দোলন জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরিস্থিতি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনায় তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে পরের দিনের গায়েবানা জানাজার পর ঢাকা শহরের পরিস্থিতির ওপর কারও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কারও নির্দেশ ছাড়াই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মহল্লা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল রাজপথে নেমে পড়ে। ফেব্রুয়ারি জুড়ে ঢাকা শহর ছিল প্রতিবাদ, মিছিল আর হরতালের শহর। ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর মফস্বলে ছড়িয়ে পড়লে সেখানেও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, সমাবেশ হয়। গঠিত হয় সংগ্রাম কমিটি। এ আন্দোলনে ঢাকার মতোই এই প্রথম কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষ যুক্ত হয়।

৭. অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন: বাংলা ভাষাভাষীদের পাকিস্তানিরা অযোগ্য মনে করত। এজন্য তাদেরকে উচ্চতর কোনো পদে চাকরি প্রদান, সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ এবং সরকারি চাকরিতে নিয়োগে কম গুরুত্ব প্রদান করত। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির চেতনাবোধের ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়, যা ক্রমান্বয়ে বাঙালিকে অধিকার সচেতন করে তোলে এবং পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে আগ্রহী করে তোলে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

৮. জাতীয় ঐক্য ও সংহতি পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম চেতনাবোধ কাজ করে। এটি ক্রমান্বয়ে 'উর্দু' ভাষীদের প্রতি গভীর ঘৃণার জন্ম দেয় এবং বাঙালিদের মধ্যকার সংহতি ও একাত্মতার জন্ম দিতে থাকে। পাকিস্তানিদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাতে থাকে এবং নতুন জাতিসত্তার জন্ম দিতে থাকে।

৯. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ সাধিত হতে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির বিপক্ষে সংখ্যালঘু পাকিস্তানিরা যে প্রভাব বিস্তার করত তা বাঙালি উপেক্ষা করে এদেশের স্বায়ত্তশাসন পেতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তাদের মাঝে গণতান্ত্রিক মনোভাব বিকশিত হতে থাকে। ভাষা আন্দোলন এরই বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

১০. কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে আঘাত এসময় সমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও মায়ের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মেয়েরা রক্ষণশীলতার প্রাচীর পেরিয়ে রাস্তায় নামে। ভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে অনেক ছাত্রীই প্রথমে গোপনে পোস্টার লিখে, চাঁদা দিয়ে সহযোগিতা করতেন। অবশ্য ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে অনেক মেয়ে সরাসরি মিছিল, মিটিং-এ ছেলেদের সঙ্গে অংশ নেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রথম শোভাযাত্রায় মেয়েরাই অগ্রভাগে ছিলেন। নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনের অগ্নিকন্যা ছিলেন মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম। এছাড়া চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, দিনাজপুর, সৈয়দপুরে নারী সমাজের ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ভাষা আন্দোলনের ফলে এমনিভাবে প্রকাশ্যে মহিলাদের সভা-সমিতিতে, মিছিলে যোগদান সমাজে নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

১১. রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় ৪টি পৃথক ভাবাদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক ধারা লক্ষণীয় ছিল। যথা-

(i) মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ আবার চারটি উপদলে বিভক্ত ছিল- (ক) নাজিমুদ্দিন-আকরাম খাঁ গ্রুপ, (খ) সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপ, (গ) এ. কে. ফজলুল হক গ্রুপ ও (ঘ) মওলানা ভাসানী গ্রুপ। প্রথম উপদলটি ছিল কট্টর ও উর্দুর পক্ষে। বাকি উপদলগুলো ছিল বাংলার পক্ষে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ বাকি তিনটি উপদলই মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করে।

(ii) আংশিক ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক ধারার প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় কংগ্রেস; এদের তেমন প্রভাব না থাকলেও এরা ছিল বাংলার পক্ষে।

(iii) বিপ্লবী সাম্যবাদী ভাবধারার প্রতিনিধিত্বকারী কমিউনিস্ট পার্টি।

(iv) মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসা প্রগতিশীল গণআজাদী লীগ। এরূপ রাজনৈতিক বিভাজন রাজনীতিতে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক মেরুকরণ ঘটায়। জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেয়নি। জনগণের এ মানসিকতা উপলব্ধি করেই কংগ্রেস, আওয়ামী মুসলিম লীগ, গণআজাদী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নির্বাচনি কর্মসূচি ও দলীয় কর্মসূচিতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের জোয়ারে অনেক উদারপন্থি মুসলিম লীগের নেতাকর্মীরা ভাষা আন্দোলন ও আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

১২. রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগের পরাজয় ভাষা আন্দোলনে দলের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতাদের ভূমিকা তাদের চরিত্র আরও উন্মোচিত করে। ১৯৫২ সালেই আওয়ামী লীগ, গণতান্ত্রিক দল, ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মুসলিম লীগ বিরোধী জোট গঠনের সূচনা করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, গণতন্ত্রীদল ও পাকিস্তান খেলাফতে রব্বানী পার্টি মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। নির্বাচনে ভাষা আন্দোলনের সমর্থক যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়যুক্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন আইন পরিষদ নির্বাচনে তার এলাকার সম্পূর্ণ অপরিচিত তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নওয়াজ খানের কাছে পরাজিত হন। কারও কারও জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়। এরপর আর কোনো নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হতে পারেনি।

১৩. বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি: ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে ভাবিয়ে তোলে।১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ পাকিস্তান গণপরিষদের বিবেচনার জন্য প্রেরণের একটি প্রস্তাব স্বয়ং মুসলিম লীগ পাস করে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহিদ দিবস ঘোষণা করে। এছাড়া একই বছর গণপরিষদ পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে উর্দু ও বাংলা এবং পার্লামেন্টে ইংরেজি ছাড়াও উর্দু ও বাংলায় বক্তব্য রাখার বিধান করা হয়। এতে একদিকে বাঙালির আন্দোলনের বিজয় সূচিত হয়, অন্যদিকে বাংলা ভাষার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

১৪. বাংলা ভাষা চর্চা ও বিকাশ: রাষ্ট্রভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়। কবি, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মীরা নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হন। হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হকসহ অনেকে কাব্য ও সাহিত্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৫৩) এ পালাবদলের স্বাক্ষরবাহী। আবদুল গাফফার চৌধুরীর কথায় ও আলতাফ মাহমুদের সুরে রচিত হলো বাঙালির প্রাণের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। প্রত্যেক বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে রচিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাঙালি জাতিকে আত্মপরিচয়ের সন্ধান দেয়। এভাবে ভাষা আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

১৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ: ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৮৮টি দেশে দিবসটি ভাষাশহিদদের স্মরণে যথাযোগ্য মর্যাদাসহকারে পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব

১৬. স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণা: ভাষা আন্দোলন ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ক্রমে এর সাথে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনকালে ও পরে বিভিন্ন লেখনী ও দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু বাংলা ভাষা নয় বরং বাঙালিদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপিত হয়। গণপরিষদে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যানুপাতিক আসন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি নিয়োগ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর দাবি করা হয়। যুক্তফ্রন্ট এসব দাবিকে প্রথম জনসমক্ষে নিয়ে আসে। যা ষাটের দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবিতে পরিস্ফুটিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নে বাঙালি জাতি প্রথম পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেয়। এ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা পাকিস্তানি শাসকচক্রের প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয় এবং ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যোগায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫– বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট

টপিক – ০২ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

টপিক ০২: বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

জাতীয়তাবাদ হচ্ছে মানসিক চেতনা বা অনুভূতি। জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের অস্তিত্বের মূল শক্তি। ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, দৈহিক আকার ও অন্যান্য কারণে বাঙালি জাতি অন্যান্য জাতিসত্তা থেকে পৃথক।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ হঠাৎ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর উদ্ভবের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা কাজ করেছে। পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ধারাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো-

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

১. ভাষা আন্দোলন: ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ও আদর্শাশ্রয়ী একটি রাজনৈতিক মতবাদ ছিল জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব। এর মূলকথা ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র হবে। ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি আলাদা রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে এ তত্ত্ব ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ তীব্র, ও বিয়ান প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। যার প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের - মায়ের ভাষা ও মুখের ভাষা বাংলাকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে জন্ম নেয় ভাষাগত ঐক্য। অনেক রক্তের বিনিময়ে ১৯৫২ সালে তীব্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি পায়। রোপিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ।

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে একক রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে আসে এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন করে তোলে। অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ, নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি, উদার দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা, সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে নতুন পরিমণ্ডলে নিয়ে যায়। ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালি জাতি পরবর্তীকালে সংঘটিত প্রতিটি আন্দোলনে প্রেরণা লাভ করে। ভাষা আন্দোলনের শিক্ষাই বাঙালি জাতিকে স্বাধিকার আন্দোলনে দীক্ষিত করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে প্রেরণা যোগায়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

২. রাজধানী নির্বাচন নিয়ে সমস্যা: ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পর বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের কারণসমূহের মধ্যে রাজধানী নির্বাচন নিয়ে সমস্যা অন্যতম। পাকিস্তান সৃষ্টির পর করাচি শহরকে পাকিস্তানের রাজধানী করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জাতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা জনসংখ্যার অনুপাতে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা ঢাকাকে রাজধানী করাকে যুক্তিসংগত ও ন্যায়সংগত মনে করে এবং এ ব্যাপারে তারা ঐক্য অনুভব করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

৩. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন: ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পর ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভা চলছিল। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের পরাজয়ের আশঙ্কাই ছিল নির্বাচন বিলম্বিত হওয়ার কারণ। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থীর পরাজয়ে তা স্পষ্টত ধারণা করা যাচ্ছিল। অবশেষে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়।

প্রাদেশিক আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। এর মধ্যে ২৩৭টি আসন মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এবং ৭২টি আসন অমুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল। মুসলমানদের ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৪টি (এর মধ্যে যুক্তফ্রন্টভুক্ত প্রধান দল আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৩টি), মুসলিম লীগ ৯টি, নির্দল/স্বতন্ত্র ৪টি আসন লাভকরে। আর অমুসলমান সম্প্রদায়ের ৭২টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, তফশীলী ফেডারেশন ২৭টি, কংগ্রেস ২৪টি, খ্রিষ্টান ১টি, বৌদ্ধ ২টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি ও নির্দল/স্বতন্ত্র ১টি আসন লাভ করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

৪. অর্থনৈতিক বৈষম্য: পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় শাসকগণ ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে দাবিয়ে রাখে। ফলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতি বাঙালিদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং তাদের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা জেগে ওঠে।

৫. সংবিধান প্রণয়ন বাঙালি জনতার দাবির প্রেক্ষিতে ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৫৬ সালে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে তা বাতিল করায় পূর্ব পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯৬২ সালে সামরিক সরকার একটি অগণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করে। যার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলন বাঙালিদের মাঝে মানসিক ঐক্য গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

৬. ক্ষমতা বণ্টন নিয়ে বিরোধ: শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাবে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন ও প্রদেশসমূহে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কথা বলা হয়। অথচ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতি উপেক্ষা করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাদের মাঝে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

৭. ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন: ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ করা হয়, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করে। এছাড়া এ রিপোর্টে আরও কিছু কালাকানুন সংযোজন করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রতিহত করে এবং তাদের মনে জাতীয়তাবাদী চেতনা কাজ করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

৮. ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হলেও পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছিল। পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিকসহ নানা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের এ অবহেলা থেকে মুক্তির জন্য বিরোধী দলের সমন্বয়ে একটি সমাবেশের ডাক দেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নিয়ে লাহোরে পৌছান। তিনি ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ছয় দফা দাবি পেশ করেন। সম্মেলনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হয় দফা দাবি প্রত্যাখ্যান করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দলবল নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। ২১ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। ছয় দফা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, ছয় দফা বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর, মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙালির মুক্তির সনদ এবং বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ। শোষকের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে হয় দফা। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

৯. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ ঘটনাটি ছিল একটি মাইলফলক। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে এ মামলা করা হয়। সরকারি নথিতে এ মামলার নাম হলো 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'। এ মামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ছয় দফা কর্মসূচিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা।

১০. ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান: ১৯৬৮-৬৯ সালের ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন পরবর্তীতে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। পাকিস্তান জন্মের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করে আসছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এ বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করে। আইয়ুব সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দুই অংশ প্রথমবারের মতো একসাথে আন্দোলনে নামে। তাদের এ আন্দোলন বাঙালির জাতীয়তাবোধের চেতনাকে উজ্জীবিত করে। সর্বস্তরের জনগণের দাবির মুখে গণআন্দোলন শেষপর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

১১. ১৯৭০ সালের নির্বাচন: বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশ এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার পিছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক বেশি আর এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯৪৭ সালের পর পূর্ব পাকিস্তান ভাষা, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক দিক থেকে স্বাধীনতা চায়। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের পর ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ। এ নির্বাচন প্রথম ইয়াহিয়া খান মেনে নিতে পারেননি। পরে বাঙালির দাবির মুখে নির্বাচনের আদেশ দেন। নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করে। ৬ দফা দাবি যৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়। ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে। কারণ আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

১২ . অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব: ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য অপরিসীম। এ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব। এ আন্দোলন পাকিস্তান শাসনের ভিতকে দুর্বল করে দেয়। বাঙালি প্রমাণ করল, তাদের নিকট পাকিস্তান সরকারের নির্দেশের কোনো মূল্য নেই। অপরদিকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যে পূর্ব বাংলায় কতটুকু গ্রহণযোগ্য তাই প্রমাণিত হলো। মূলত ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের সামরিক হস্তক্ষেপ পর্যন্ত পাকিস্তানি প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে এবং দেশ পরিচালিত হতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। তিনিই হয়ে উঠেন সরকারপ্রধান এবং তার ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন হয়ে ওঠে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটের অনুরূপ। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া প্রদান করে পূর্ব বাংলার সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস, সচিবালয়, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, নিম্ন আদালত, হাইকোর্ট, পুলিশ প্রশাসন, ব্যাংক-বিমা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশ অমান্য করে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ভেঙে পড়ে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। ইয়াহিয়া সরকার কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এর পাল্টা জবাব হিসেবে ১৪ মার্চ বঙ্গবন্ধু ১৫ দফাভিত্তিক এক নির্দেশনামা জারি করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

১৩. কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব নিয়ে সংকট: পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত মূলনীতি কমিটির প্রথম রিপোর্ট পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় কমসংখ্যক প্রতিনিধি প্রদানের কথা উল্লেখ করায় আইনসভায় বাঙালি সদস্যদের সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে।

১৪. সামাজিক ও সংস্কৃতিগত অমিলজনিত সমস্যা: পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন ইত্যাদি প্রায় সবক্ষেত্রেই ছিল ব্যাপক বৈসাদৃশ্য। আর তাই শুরু থেকেই উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালি জনগণের ভাষা ও সংস্কৃতি বিনষ্টের ষড়যন্ত্র এবং সামাজিক জীবনযাপন পদ্ধতিতে আঘাত এলে বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনা জাগ্রত হয়।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

১৫. জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য: পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ছিল রক্ষণশীল, সংকীর্ণমনা ও অনেকটা ধর্মান্ধ। অপরদিকে, বাঙালি জনগণ ছিল তুলনামূলক উদার, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের একটি বিরাট অংশ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের পক্ষপাতি ছিল। কিন্তু বাঙালি জনগণ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাসহ একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাচেতনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন শুরু করলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে।

১৬. বাস্তুহারাদের আগমন পাকিস্তান জন্মের পূর্ব থেকেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে বিহারসহ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহুসংখ্যক বাস্তুহারা পূর্ব বাংলায় চলে আসে। তাদের সমস্যাও ক্রমে জটিল আকার ধারণ করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

১৭. পূর্ব বাংলার উর্দুভাষী কর্মকর্তাদের আধিপত্য: প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলা শাসিত হতে থাকে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত উর্দুভাষী কর্মকর্তাদের দ্বারা। ঐতিহাসিক কারণে পূর্ব বাংলার তেমন কোনো নিজস্ব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিল না। ফলে সচিবালয়, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে শাসনকার্যের দায়িত্ব উর্দুভাষী কর্মকর্তাদের ওপরই বর্তায়। তারাও ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উর্দুর যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করে। মানি অর্ডার ফরম, টেলিগ্রাম ফরম, ডাকটিকিট এমনকি মুদ্রায়ও উর্দুর ব্যবহার শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনও ছিলেন উর্দুভাষী। পূর্ব বাংলায় পরগাছা অবাঙালিদের কর্তৃত্ব ও তাদের চাপিয়ে দেওয়া উর্দুভাষার আবশ্যিক ব্যবহারসহ বিভিন্ন বৈরিতা বাঙালির মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশধারা

১৮. ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কাল রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঘুমন্ত নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু করে পাকিস্তানের মৃত্যু পরোয়ানা ঘোষণা করে। যা অপারেশন সার্চ লাইট নামে পরিচিত। আলোচনা ভেঙে দিয়ে গণহত্যা শুরু করায় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো চিন্তা করেননি। তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার আহ্বান জানান। অবশেষে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়। প্রায় ৯৩ হাজার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্য এ দিন বাঙালির কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় ঘটে। আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের চরম বিকাশ ঘটে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এ সংগ্রামের সফলতায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাস্তবে রূপ দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ঘটনা পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার মানুষের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তারা নিজেদের আলাদা ভাবতে শুরু করে। তারা শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের ঊর্ধ্বে থেকে নিজেদের ভাগ্য গড়তে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এভাবে পর্যায়ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫– বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট

টপিক – ০৩ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

টপিক ০৩: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলে তৎকালীন পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান নামধারণ করে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এবং ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ থাকলেও শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন চালাতে থাকে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একাধিপত্যের দরুন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার আর্থসামাজিক বৈষম্য নিচে আলোচনা করা হলো-

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

সামরিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক ক্ষমতায় চরম অবহেলা করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত বাঙালির সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার সামরিক লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি অবলম্বন করত। সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ পাঞ্জাবি ক্ষমতায় ছিল। ফলে পূর্ব পাকিস্তান নির্যাতিত হতে থাকে। বাঙালির দাবির মুখে সামরিক বাহিনীতে বাঙালির পরিমাণ বাড়লেও তা ছিল অতি নগণ্য। ১৯৫৫ সালে সামরিক বাহিনীতে ২,২১১ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৮২ জন বাঙালি ছিলেন। ১৯৬৬ সালের এক জরিপে দেখা যায়, সামরিক বাহিনীতে উচ্চ পর্যায়ে ১৭ জন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার মাত্র ১ জন বাঙালি ছিলেন। এসময় সামরিক অফিসারদের মধ্যে ৫% বাঙালি ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাসদস্যের ৫ লক্ষ জনের মধ্যে ২০ হাজার বাঙালি ছিলেন। আইয়ুব শাসনামলে সামরিক বাহিনীতে ব্যয় ছিল অনেক বেশি। সামরিক বার্ষিক বাজেটের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাহ্য করা হতো না। ওই সময় মোট বাজেটের ৬০% ব্যয় হতো সামরিক বাহিনীতে। এমনকি স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর অর্থাৎ তিন বাহিনীর সদর দপ্তর (Head Quarter) ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

সামরিক বৈষম্য

নিচে একটি ছকের মাধ্যমে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বৈষম্য দেখানো হলো–

বিভাগ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
১. স্থলবাহিনী	৯৫%	৫%
২. নৌবাহিনী (কারিগরি)	৮১%	১৯%
৩. নৌবাহিনী (অকারিগরি)	৯১%	৯%
৪. বিমানবাহিনীর বৈমানিক	৯১%	৯%
৫. সশস্ত্রবাহিনী (সংখ্যায়)	৫,০০,০০০	২০,০০০

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

প্রশাসনিক বৈষম্য

প্রশাসনিক দিকে পাকিস্তানের চালিকাশক্তি ছিল সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের কাছে। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানে যে মন্ত্রণালয় গঠিত হয় তার বেশিরভাগ শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলেন। মন্ত্রণালয়গুলোতে শীর্ষস্থানীয়দের ৯৫৪ জনের মধ্যে ১১৯ জন বাঙালি ছিলেন মাত্র। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২,০০০ কর্মকর্তার মধ্যে ২,৯০০ জন কর্মকর্তা বাঙালি ছিলেন।

১৯৪৭ সালে করাচিতে রাজধানী হওয়ায় সকল সরকারি অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যাপকহারে চাকরি লাভকরে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদের কর্মকর্তাগণের অধিকাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এ কারণে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালিদের সাফল্য কম ছিল। তবে পরবর্তী দিনগুলোতে বাঙালিদের সাফল্য ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের গেজেটেড কর্মকর্তা ছিলেন যথাক্রমে ১,৩৩৮ ও ৩,৭০৮ জন এবং নন গেজেটেড কর্মকর্তা ছিলেন যথাক্রমে ২৬,৩১০ ও ৮২,৯৪৪ জন। এছাড়া বহির্বিশ্বের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ৬৯ রাষ্ট্রদূতের মধ্যে ৬০ জনই পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলেন।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

প্রশাসনিক বৈষম্য

১৯৬৬ সালের তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মচারীদের হার নিচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো–

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় চাকুরে, ১৯৬৬

	বাঙালি	পশ্চিম পাকিস্তানি
প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারিয়েট	১৯%	৮১%
দেশরক্ষা	৮.১%	৯১.৯%
শিল্প	২৫.৭%	৭৪.৩%
স্বরাষ্ট্র	২২.৭%	৭৭.৩%
শিক্ষা	২৭.৩%	৭২.৭%
তথ্য	২০.১	৭৯.৯%
স্বাস্থ্য	১৯%	৮১%
কৃষি	২১%	৭৯%
আইন	৩৫%	৬৫%

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালের যুদ্ধের প্রের পূর্ব পাকিস্তান রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি থাকলেও সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। আইয়ুব সরকার ছলেবলে-কৌশলে স্বৈরশাসন কায়েম করার চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে। সর্বক্ষেত্রে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধি ঘটায়। পশ্চিম পাকিস্তান এদেশের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়।

তাদের শৈল্পিক ও মেধাশক্তিকে শূন্য করে দিতে বার বার রাজনৈতিক নেতাদের জেলে বন্দী করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার ও বন্দি করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি মন্ত্রিপরিষদে বাঙালি প্রতিনিধির সংখ্যা খুবই কম ছিল। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দিতে অনীহা প্রকাশ প্রকাশ করে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

রাজনৈতিক বৈষম্য

এমতাবস্থায় ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের আইন পরিষদ নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৪টি এবং মুসলিম লীগ লাভ করে মাত্র ৯টি আসন। তৎকালীন রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ এ বিজয়কে পাকিস্তানিদের শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির চরম হুঁশিয়ারি সংকেত বলে ধরে নেন। নির্বাচনের ফলাফল দেখে পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালি জাতির ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এ সময় যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন বানচাল করে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসন জারি করে। পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়। অতঃপর ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা সংবলিত মুক্তির সনদ হিসেবে যে ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ করেন তাতেও পাকিস্তানিরা ক্ষিপ্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করে। তবে বাঙালি জাতির চরম আন্দোলনের মুখে মামলা প্রত্যাহার ও তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনোত্তর ক্ষমতা ও হস্তান্তরের এ রাজনৈতিক সংকট পাকিস্তানের পূর্ব বাংলার প্রতি রাজনৈতিক বৈষম্যেরই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের মাত্রা ছিল অধিক। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দিক নিয়ন্ত্রণ হতো কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা। প্রাদেশিক সরকারের হাতে কোনো ক্ষমতা ছিল না বললেই চলে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে রাজস্ব আদায় হতো তার অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতো। দেশের সব ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। স্থানীয় শাসনভার প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন ও শোষণ করত। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ হতো তাও পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভর করতে হতো। এমনকি উদ্বৃত্ত অর্থও পশ্চিম পাকিস্তানের তহবিলে জমা হতো। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে কখনো মূলধন গড়ে ওঠেনি।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পশ্চিম পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করেছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিনিধি না থাকায় কিছুই করার ছিল না পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। জোরজুলুম করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত করে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি বরাদ্দ করা হয়। আর দ্বিতীয়টিতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১,৩৫০ কোটি আর পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৯৫০ কোটি রুপি বরাদ্দ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান রাজধানীর উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যয় বরাদ্দ করে। ১৯৫৬ সালে পশ্চিম পাকিস্তান করাচির উন্নয়নের জন্য ৫৭০ কোটি টাকা ব্যয় করে, যা সরকারি আয়ের ৫৬.৪% ছিল। ১৯৬৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তান ইসলামাবাদের জন্য যেখানে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করে সেখানে ঢাকার জন্য ব্যয় করে মাত্র ২৫ কোটি টাকা। ১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত মোট রপ্তানি আয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল ৫৪.৭%। অথচ রপ্তানি আয় বেশি করলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমদানি ব্যয় ছিল মাত্র ৩১.১%। রপ্তানি আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পের কাঁচামালের দাম কম থাকলেও অধিকাংশ শিল্প-কলকারখানা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অবাধে স্বর্ণ ও অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিময় করা যেত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অর্থ ও স্বর্ণ পূর্ব পাকিস্তানে আনার ওপর সরকারের বিধিনিষেধ ছিল।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি তুলনামূলক চিত্র

বিভিন্ন ধরনের ব্যয়ের খাত	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	২৫%	৭৫%
শিল্প উন্নয়নমূলক কর্পোরেশন ব্যয়	৪২%	৫৮%
উন্নয়ন প্রকল্পে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়	২০%	৮০%
আমেরিকান সাহায্যের ব্যয়	৩৪%	৬৬%
বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়	৪%	৯৬%
বিনিয়োগ সংখ্যা ও শিল্পঋণ	২০%	৮০%
শিল্প উন্নয়ন ব্যাংক	২৪%	৭৬%
অন্যান্য ও গৃহনির্মাণ	১২%	৮৮%

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

সামাজিক বৈষম্য

সামাজিক অবকাঠামোগত দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান অনুন্নত ছিল। হাসপাতাল, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, ডাকঘর, টেলিফোন প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। '৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান সামাজিক অবকাঠামোগতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে অবহেলিত থাকায় পূর্ব পাকিস্তান সামাজিকভাবে অনুন্নত।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য

পশ্চিম পাকিস্তান পরিকল্পিতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। তাদের ইচ্ছা শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে নিরক্ষর বাখা। পশ্চিম পাকিস্তান নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাকে দমিয়ে উর্দুভাষা ও আরবি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার কোনো উন্নয়ন তারা করেনি। শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো বরাদ্দ করা হয়নি। ১৯৫৫-৬৭ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ২,০৮৪ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭৯৭ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ করা হয়।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর্থসামাজিক বৈষম্য

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে চরমভাবে অবহেলা করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ৫৬% বাঙালি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা উর্দু করার লক্ষ্যে তারা উঠেপড়ে লাগে। চাকরি, অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষা প্রচলনের চেষ্টা করে। একই সাথে ইসলামের নামে ও সাম্প্রদায়িক আবরণে পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের চিরাচরিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যুদ্ধের সময় থেকে নগ্ন আকার ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'হিন্দু' ছিলেন বলে তার গান পাকিস্তানি বেতারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। নজরুল ইসলামকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পরও তার ইসলামি গানগুলো থেকে 'হিন্দুয়ানি' শব্দসমূহ বাদ দিয়ে পরিবেশন করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫– বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট

টপিক – ০৪ ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

টপিক ০৪: ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে তিনি সংবাদ সম্মেলন করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। ছয় দফাকে তিনি 'আমাদের বাঁচা মরার দাবি' বলে উল্লেখ করেন। দফাগুলো হলো-

প্রথম দফা: পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠান।

দ্বিতীয় দফা: কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুটি বিষয় থাকবে, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অন্যান্য সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

তৃতীয় দফা: সারাদেশে হয় অবাধে বিনিয়োগযোগ্য দুই ধরনের মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন করা।

চতুর্থ দফা : সকল প্রকার কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

পঞ্চম দফা: অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে, এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে।

ষষ্ঠ দফা: অঙ্গরাজ্যগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধা সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ছয় দফার সামাজিক গুরুত্ব

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তির দিক নির্দেশনা ছিল বলে একে বাঙালির মুক্তির সনদ বলে অভিহিত করা হয়। ছয় দফা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, ছয় দফা বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙালির মুক্তির সনদ এবং বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ। শোষকের হাত থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয় দফা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ছয় দফার গুরুত্ব অপরিসীম। ছয় দফার বিরুদ্ধে আইয়ুব খান কঠোর নিন্দা জানান। আইয়ুব খান ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বলে আখ্যা দেন। শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সারাদেশে হরতাল পালিত হয়। মিছিলে তেজগাঁওয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান শ্রমিক মনু মিয়া ও আবুল হোসেনসহ নাম না জানা অনেক ব্যক্তি। ১০ মে ১৯৬৬ সালের মধ্যে ৩৫০০ জন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ৬ দফার গণজাগরণ ধ্বংস করে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করতে ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা দায়ের করে।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ছয় দফার সামাজিক গুরুত্ব

১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের মুখে সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৬ দফাকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে না গিয়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ শুরু করে। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে লাল-সবুজের পতাকা অর্জন করে।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ছয় দফার সামাজিক গুরুত্ব

১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের সামাজিক গুরুত্ব নিম্নরূপ-

বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ছয় দফা দাবি হলো পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তির সনদ।

ছয় দফা দাবির মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে লালন করে। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা নতুন করে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করে।

ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ পাঞ্জাবিদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

ছয় দফা আন্দোলন স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে।

ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাঙালির মুক্তির সনদ নামে পরিচিত এ আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও শাসন থেকে বাঙালিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়েছে।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে আইয়ুববিরোধী যে আন্দোলন শুরু করে তাই গণঅভ্যুত্থান। পাকিস্তান জন্মের পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করে আসছে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এ বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করে। আইয়ুব সরকারের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দুই অংশ প্রথমবারের মতো একসাথে আন্দোলনে নামে। তাদের এ আন্দোলন বাঙালির জাতীয়তাবোধের চেতনাকে উজ্জীবিত করে। সর্বস্তরের জনগণের দাবির মুখে গণআন্দোলন শেষপর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবি ছিল বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি, বাঙালি সত্তার বিকাশ ঘটানোর দাবি। সমগ্র বাঙালি জাতি এ আন্দোলনে অংশ নিয়ে নিজেদের অধিকারকে আদায় করেছে। ১১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার আসামি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য গণঅভ্যুত্থান সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

১. গণতন্ত্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন;

২. স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা;

৩. সকল গণবিরোধী ও অশুভ শক্তির মূলোৎপাটন;

৪. সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব লোপ;

৫. সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য আসামিদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া;

৬. পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণ।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সামাজিক গুরুত্ব

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল ছিল প্রত্যক্ষ। দ্রুত আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যদের মুক্তি দেওয়া হয়। আন্দোলন চলাকালে আইয়ুব খানের পতন হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসলেও টিকে থাকতে পারেননি। গণঅভ্যুত্থানের সামাজিক গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো-

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে।

সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবি স্পষ্টভাবে সামনে আসে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের রায় পরিষ্কার হয়।

গণঅভ্যুত্থানের মুখে পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বিনাশ ঘটে।

আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক বৈষম্য থেকে মুক্তি পায়।

পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎসাহ-উদ্দীপনা বাঙালিরা গণঅভ্যুত্থান থেকে পায়।

এ অভ্যুত্থান ছিল শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ারস্বরূপ।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

১৯৭০-এর নির্বাচন

ইয়াহিয়া খান

পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফাসহ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হলো পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গবন্ধুসহ অন্যদের মুক্তি। ছাত্রজনতার চাপের মুখে আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রের দাবি ফিরিয়ে দেবেন এ আশ্বাস দেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চাইলেন। ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ ও ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা পিছিয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতির কারণে জনগণের পাশে দাঁড়ানো তখন মুখ্য হয়ে ওঠে। ফলে নির্বাচনের তারিখ জাতীয় পরিষদের ৭ডিসেম্বর ও প্রাদেশিক পরিষদের ১৭ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়।

তবে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু অঞ্চলে নির্বাচন পিছিয়ে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৭জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

নির্বাচন এর আইন কাঠামো

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে নির্বাচনসংক্রান্ত আইন কাঠামোর আদেশের মূল ধারাগুলো ঘোষণা করেন। তিনি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা কত হবে, নির্বাচন প্রক্রিয়া কী হবে, কত দিনের মধ্যে নির্বাচিত পরিষদ সংবিধান তৈরি করবে এসব প্রক্রিয়া নিয়ে আদেশ জারি করেন।

তন্মধ্যে প্রধান দিকগুলো হলো-

১. পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে প্রদেশগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে এবং ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

২. ১৩ জন মহিলা প্রতিনিধি নিয়ে ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদ হবে আর ৬২১ জন সদস্য নিয়ে পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ হবে।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

নির্বাচন এর আইন কাঠামো

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন বণ্টন

অঞ্চল	জাতীয় পরিষদ			প্রাদেশিক পরিষদ		
	সাধারণ	মহিলা	মোট	সাধারণ	মহিলা	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯	৩০০	১০	৩১০
পাঞ্জাব	৮২	৩	৮৫	১৮০	৬	১৮৬
সিন্ধু	২৭	১	২৮	৬০	২	৬২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	১৮	১	১৯	৪০	২	৪২
বেলুচিস্তান	৪	১	৫	২০	১	২১
কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা	৭	-	৭	-	-	-
মোট	৩০০	১৩	৩১৩	৬০০	২১	৬২১

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

নির্বাচন এর আইন কাঠামো

৩. নির্বাচনে ১ জন ব্যক্তির একের অধিক ভোট দেওয়ার রীতি বর্জিত হবে।

৪. ভোটার তালিকা ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের জুনের মধ্যে তৈরি হবে।

৫. সংবিধান রচনার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ১২০ দিনের মধ্যে প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এসময়ের মধ্যে কাজ সমাধা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ ভেঙে নতুন নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে। তবে সংবিধান রচনা এবং সংবিধানকে সত্যায়িতকরণ পর্যন্ত সামরিক শাসন বহাল থাকবে। পাশাপাশি আইনগত কাঠামোর ২০নং ধারায়

সংবিধানের ছয়টি নীতি বেঁধে দেওয়া হয়-

ক. সরকার পদ্ধতি হবে ফেডারেল;

খ. রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ইসলামি আদর্শ;

গ. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে;

ঘ. জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

ঙ. সম্পর্ক ভালো করার জন্য বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বৈষম্য দূর করতে হবে;

চ. বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

নির্বাচন এর আইন কাঠামো

ইয়াহিয়া খানের ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই ঘোষণা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারক বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশনের তৈরি নির্বাচনের পূর্বে ভোটার তালিকায় পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩,১২,১৪,৯৩৫ জন ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটারের সংখ্যা ২,৫২,০৬,২৬৩ জন।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে আওয়ামী লীগপন্থি দলগুলো আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার মনোবাসনা ব্যক্ত করে। কিন্তু অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেন। মোট ৭৮১ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দল থেকে পৃথক প্রার্থী মনোনীত হয়। আওয়ামী লীগ নির্বাচনি প্রতীক নৌকা নিয়ে ১৬২ জন প্রার্থী জাতীয় পরিষদের পক্ষ থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়নের তালিকা নিম্নরূপ-

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল

জাতীয় পরিষদের জন্য দলগত প্রার্থী সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তান

	দলের নাম	প্রার্থীসংখ্যা
১.	নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	১৬২
২.	নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামী ইসলাম	৪৯
৩.	ইসলাম গণতন্ত্রী দল	৫
৪.	জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান	৭০
৫.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, পশ্চিম পাকিস্তান	১৫
৬.	জাতীয় গণমুক্তি দল	৫
৭.	কৃষক-শ্রমিক পার্টি	৪
৮.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	১৪
৯.	পাকিস্তান দরদি সংঘ	১
১০.	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	৭৯
১১.	পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	৯৩
১২.	পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৫০
১৩.	পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	৬৫
১৪.	পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)	৩৯
১৫.	পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস	৪
১৬.	পাকিস্তান জাতীয় লীগ	১২
১৭.	স্বতন্ত্র	১১৪
	মোট	৭৮১

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল

জাতীয় পরিষদের জন্য দলগত প্রার্থী সংখ্যা, পশ্চিম পাকিস্তান

	দলের নাম	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উ.প. সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান
১.	নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ	৩	২	২	১
২.	নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামী ইসলাম	৪	–	২	–
৩.	বেলুচিস্তান ইউনাইটেড ফ্রন্ট, সংযুক্ত	১	১	২	–
৪.	জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান	৪৪	১৯	১৫	২
৫.	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, পশ্চিম পাকিস্তান	৪৭	২১	১৯	৪
৬.	জাতীয় গণমুক্তি দল	–	১	–	–
৭.	থাকসার তেহরিক	২	–	–	–
৮.	মারকাজী জমিয়তে আহলে হাদিস, পাকিস্তান	২	–	–	–
৯.	মারকাজী জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান	৩৬	৮	১	–
১০.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	২	২	–	১

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল

	দলের নাম	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উ.প. সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান
১১.	পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২১	৩	২	১
১২.	পাকিস্তান মাসিহী লীগ	১	১	১	–
১৩.	পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	২৪	৬	১	১
১৪.	পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৫০	১২	৫	২
১৫.	পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	৩	১২	১৭	৪
১৬.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)	–	৬	১৬	৩
১৭.	পাকিস্তান পিপলস পার্টি	৭৭	২৫	১৬	১
১৮.	সিন্ধু-করাচি মুহাযির পাঞ্জাবি পাঠান মুত্তাহিদা মাহাজ	১	১	–	–
১৯.	সিন্ধু সংযুক্ত ফ্রন্ট	–	১	–	–
২০.	স্বতন্ত্র	১১৫	৪৫	৪৫	৬
	মোট	৪৬৩	১৭০	১৪২	২৬

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ১৬৭টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। '৭০-এর নির্বাচনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে জয়লাভ করে।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনি ফলাফল

দলের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	বেলুচিস্তান	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	মহিলা	মোট (মহিলা আসন বাদে)
আওয়ামী লীগ	১৬০	–	–	–	–	–	০৭	১৬০
পিপিপি	–	৬৪	১৮	০১	–	–	০৫	৮৩
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	–	০১	০১	০৭	–	–	–	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	–	০৭	–	–	–	–	–	৭
জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (হাজারভী)	–	–	–	০৬	০১	–	–	৭
মারকাজী জমিয়ত উল উলেমা-ই-ইসলাম	–	–	০৪	০৩	–	–	–	৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)	–	–	–	০৩	০৩	–	০১	৬
জামায়াতে-ই-ইসলামী	–	০১	০২	০১	–	–	–	৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	–	০২	–	–	–	–	–	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	০১	–	–	–	–	–	–	১
স্বতন্ত্র	০১	০৩	০৩	–	–	০৭	–	১৪
মোট	১৬২	৭৮	২৮	২১	০৪	০৭	১৩	৩০০

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

নির্বাচনের ফলাফল

পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদে বিভিন্ন দলের অর্জিত ফলাফল

	দলের নাম	মোট আসন	প্রাপ্ত আসন
১.	আওয়ামী লীগ	৩০০	২৮৮
২.	পিডিপি	"	২
৩.	জমিয়াতে ইসলাম	"	০
৪.	উলেমা-ই-ইসলাম	"	১
৫.	নেজামী ইসলাম	"	০
৬.	জামায়াতে ইসলামী	"	১
৭.	ন্যাপ (ওয়ালী)	"	১
৮.	স্বতন্ত্র	"	৭

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

নির্বাচনের ফলাফল

নির্বাচনে বিজয়ের কারণে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসীন হবে এটি স্বাভাবিক। কিন্তু ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি শুরু করেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু জুলফিকার আলীর প্ররোচনার কারণে ১ মার্চ অধিবেশন স্থগিত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি তথা কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, ডাক্তার, উকিলসহ সর্বস্তরের জনগণ বিক্ষোভ করে। রাজপথে সাধারণ জনতার সঙ্গে সেনাসদস্যদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এ সময় বহু সাধারণ মানুষ নিহত হন এবং অনেকে মৃত্যুযন্ত্রণায় বিলাপ করেন। ওই দিন ছাত্রলীগের নেতারা 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ছাত্ররা সারাদেশে ২ মার্চ ধর্মঘটের ডাক দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে ছাত্রলীগের কর্মীরা ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। ওইদিন ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ৫ (পাঁচ) দফা কর্মসূচির প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ কর্মসূচিই বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ইশতেহার' নামে পরিচিত এবং পরে সমাবেশে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

নির্বাচনের ফলাফল

পাশাপাশি ৪, ৫ ও ৬ মার্চ প্রতিদিন অর্ধবেলা হরতালের কর্মসূচি দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ ছাত্রদের এ ইশতেহারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে হরতাল পালন করলে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। এমতাবস্থায় ইয়াহিয়া খান ভীত হয়ে ৬ মার্চ বেতার ভাষণে ঢাকায় ২৫ মার্চ পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু এদেশের মানুষ তাতে আশ্বস্ত হতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও আস্থা রাখতে না পেরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সামরিক শাসনবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনসভার আয়োজন করেন।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং পাকিস্তানের মৃত্যুবার্তা বহন করে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো-

১.বাঙালি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি: ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬-এর ছয় দফাভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলন ও ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে- যা বাঙালিদের অভূতপূর্ব বিজয়কে নিশ্চিত করে।

২. যুক্ত পাকিস্তানের মৃত্যুঘণ্টা: ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এ দল কোনো আসন পায় না। আবার পূর্ব পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপিপি কোনো আসন পায় না। অর্থাৎ পাকিস্তানের একাংশ আরেক অংশকে সমর্থন করে না। আর এ মানসিকতা থেকেই পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের সৃষ্টি হয় এবং যুক্ত পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটে।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

৩. ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিবাদ: এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

৪. বাঙালিদের আত্মপ্রত্যয়: ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল, বাঙালিদের স্বাধিকারের দাবি এবং রাজনৈতিক ঐক্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। বাঙালিরা আত্মপ্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নিজেদেরকে আত্মবলীয়ান করে তোলে।

৫. অসহযোগী মনোভাব: এ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে পিপিপি কোনো আসন পায় না। আবার পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন পায় না। ফলে উভয় অঞ্চলের জনগণের মধ্যে একটি অসহযোগী মনোভাবের সৃষ্টি হয়- যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

৬. বলিষ্ঠ নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ: যেকোনো নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পিছনে অবিসংবাদিত নেতৃত্বের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় তাকে অবিসংবাদিত নেতার আসনে সমাসীন করে। যার ফলশ্রুতিতে ৭ মার্চ '৭১-এর ঐতিহাসিক ভাষণের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে ছিনিয়ে আনে।

৭. পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিন্নতা প্রকাশ: এ নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক বৃহৎ পুঁজি ও সামরিক আমলাচক্রের দৌরাত্ম্যকে বাঙালি জনগণ প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে প্রমাণিত হয় যে, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক।

৮. শক্তিশালী কেন্দ্র ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি প্রত্যাখ্যান: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। এ রায় ছিল প্রকারান্তরে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি গণরায়। এর পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ডানপন্থি ও ধর্মভিত্তিক দলগুলোর 'শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার' দাবিও প্রত্যাখ্যান করে। বাঙালি জনগণ বুঝতে পারে যে, উক্ত দুটি দাবি আসলে রাজনৈতিক ভাওতাবাজি, যা দিয়ে জনগণকে এতদিন ধোঁকা দেওয়া হয়েছে।

ছয় দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সত্তরের নির্বাচনের সামাজিক গুরুত্ব

৯. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রভাব বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পিছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে ইয়াহিয়া খান যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তা নির্বাচন পরবর্তীকালে রক্ষা করেননি। এরপর বাঙালি জাতি স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারে যে, যুদ্ধের মাধ্যমেই বাঙালিকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে। অবশেষে নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করে। তাই বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ তৈরি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অনুপ্রেরণা যোগায়।

১০. পাকিস্তানিদের স্বপ্নভঙ্গ: এ নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানিদের প্রতিকূলে যাওয়ায় তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়। তাদের ধারণা ছিল, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হবে না এবং তারা অন্যান্য দলের সাথে কোয়ালিশন-করতে বাধ্য হবে। কিন্তু সে স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে বাঙালিরা প্রমাণ করল যে, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ এবং জাতীয় পরিষদের সবকটি আসনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় পাকিস্তানের মৃত্যুঘণ্টা বাজায় এবং মুক্তি সংগ্রামের সংকেত দেয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে মানচিত্রে পরিচিতি লাভ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫– বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট

টপিক – ০৫ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে সহপাঠীদের সাথে শহিদ মিনারে ফুল দিতে যায় নিলয়। এরপর এ দিনটি উপলক্ষে কলেজে আলোচনা সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে একজন স্যার বলেন, আজ বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক গৌরবময় দিন। এ দিনটিতে ছাত্র-জনতা রাজপথের সংগ্রামে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অনেকেই শহিদ হন এবং বাঙালি ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠা করে।

ক. ছয় দফা কত সালে উত্থাপন করা হয়?

খ. জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকটি কোন আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের উক্ত আন্দোলনটিতেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত রয়েছে- বিশ্লেষণ কর।

[রা. বো. '২২; চ. বো. '২২; সি. বো. '২২; ব. বো. '২২; দি. বো. '২২; ম. বো.'২২]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

অত্যাচারী শাসকরা মানুষের ভাষা, বর্ণের ওপর আঘাত করে। মানুষ নেমে আসে রাজপথে। হরতাল, ধর্মঘট, মিছিল, মিটিংয়ের মাধ্যমে চলে প্রতিবাদ। শহীদ হয় অনেক ছাত্র-জনতা। প্রতিষ্ঠিত হয় জনতার দাবি। পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত ২টি নির্বাচন মানুষের মধ্যে জন্ম দেয় স্বাধীনতাবোধের। বিপুল সংখ্যক মানুষ সমর্থন জানায় তাদের প্রিয় দলকে। এরই ধারাবাহিকতায় জনপথটি স্বাধীনতা লাভ করে।

ক. ছয় দফা কখন উত্থাপন করা হয়?

খ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।যা

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনসমূহ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।" তুমি কি একমত? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

[ঢা. বো. '২১; য. বো. '২১; কু. বো. '২১; চ. বো. '২১; সি. বো. '২১: দি. বো. '২১; ম. বো, '২১]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

অঞ্চলটিতে ধান, পাটের মতো অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হয়। কিন্তু এসব থেকে আয় চলে যায় শাসকদের অঞ্চলে। বাজেটে বরাদ্ধ রাখা হয় খুবই কম। কোনো কলকারখানা এই অঞ্চলে তৈরি করা হয় না। এসবের প্রতিবাদ করেন একজন রাজনৈতিক মানবিক নেতা। মানুষকে সংঘবদ্ধ করেন, প্রতিবাদ করেন, জেল খাটেন। অবশেষে ডাক দেন স্বাধীনতার।

ক. বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯ সাল গুরুত্বপূর্ণ কেন?

খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বৈষম্যের ধরনটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতা আর আমাদের বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এক ও অভিন্ন- বিশ্লেষণ কর।

[ঢা. বো. '২১; য. বো. '২১; কু. বো. '২১; চ. বো. '২১; সি. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫– বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট

টপিক – ০৬ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১.কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে?

ক. ইউনেস্কো খ. ইউনিসেফ গ. ইউসেপ ঘ. ইউএনডিপি

২. কোন আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়?

ক. ভাষা আন্দোলন খ. ছয় দফা আন্দোলন

গ. ৬৯-এর গণআন্দোলন ঘ. এগার দফা কর্মসূচি

৩."উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" এ উক্তিটি কে করেছিলেন?

ক. খাজা নাজিমউদ্দিন খ. শাহ আজিজুর রহমান

গ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ. ইস্কান্দার মির্জা

৪. কোনটি ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব প্রকাশ করে? (সকল বোর্ড '১৯]

ক. পাকিস্তানি এলিটের উদ্ভব খ. ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ

গ. নারীদের প্রগতিশীল করা ঘ. দেশবিভাগের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা

৫.ভাষা আন্দোলন কিসের বিকাশ ঘটায়?

ক. বাঙালি চেতনার খ. সংগ্রামী চেতনার গ. অসাম্প্রদায়িক চেতনার ঘ. সার্বভৌম চেতনার

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. পাকিস্তান পার্লামেন্টে কে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি তোলেন?
ক. ধীরণ কুমার বিশ্বাস
খ. শিমুল বিশ্বাস
গ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
ঘ. ধীরেন্দ্র সাহা

৭. একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয় কেন?
ক. ভাষার সর্বত্র প্রচলনের জন্য
খ. ভাষা শহিদের স্মরণে
গ. স্বাধিকার আন্দোলন স্মরণে
ঘ. পাকিস্তানিদের নিষ্ঠুরতা স্মরণে

৮. ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়-
ক. ১৯৫০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
খ. ১৯৫১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
ঘ. ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

৯. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়?
ক. পলাশীর যুদ্ধ
খ. ক্রিমিয়ার যুদ্ধ
গ. বক্সারের যুদ্ধ
ঘ. পানিপথের যুদ্ধ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১০. কত সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়?

ক. ১৯৪৬ সালে খ. ১৯৪৭ সালে গ. ১৯৪৮ সালে ঘ. ১৯৪৯ সালে

১১. মুসলিম লীগ কয়টি উপদলে বিভক্ত ছিল?

ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ২টি

১২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে কী গঠিত হয়?

ক. যুক্তফ্রন্ট খ. ঐক্যজোট গ. মহাজোট ঘ. নতুন ধারা

THANK YOU